পৃথিবীর পথে পথে

রেহনুমা বিন্‌ত আনিস

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
মটরসাইকেলে চট্টগ্রাম-বরিশাল ভ্রমণ..... ১৩
প্রবালদ্বীপে..... ২৪
Your Baby has no one else Mummy! ৩৭
তুষারকণা ৪১
আলহামদুলিল্লাহ..... ৪৫
আমি এখন রিকশা চালাই..... ৪৮
দুদিনের মেহমান..... ৫০
পিকনিক ২০১১ ..... ৫৭
ডাইনোসর যুগে ঘুরে এলাম ৬১
স্বপ্নময় তিনটি দিন..... ৬৬
নূসরাতের সাথে তিনটি দিন ৭৮
বাদল দিনের বন্ধুরা..... ৮৪
বেড়িয়ে এলাম এডমন্টন ৯০
ক্যালগেরির বসন্তকাল ৯৫
বিদেশে বাংলাদেশি ঈদ ৯৯

আবারও ডাইনোসর মিউজিয়ামে ১০৬
ওয়ান উম্মাহ কনফারেন্স ক্যালগেরি ২০১৪: দ্য ডিভাইন ম্যানুয়াল ১২৩
ঘুরে এলাম নিউইয়র্ক ১২৯
উস্তাদ নোমান আলি খানের সাথে একটি সন্ধ্যা ১৬৭
সীমান্তে ভ্রমণ ১৭৪
মেঘমেদুর প্রভাতে স্মৃতিচারণ ১৯০
মসজিদের সাথে ঝুলন্ত হৃদয় ১৯৩
জাপান সফর ১৯৬
টরোন্টো সফর ২০৯
মহাকাশের অভিযাত্রী ২১৯
ক্যালগেরির ঈদ ২২৫

ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আমরা। মাত্র ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল এলাকায় প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বাস। জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির অপ্রতুলতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, শিল্পায়নের অভাব, লেখাপড়া শিখে কায়িক পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানের অভাব, কর্মবিমুখতার ফলে বেকারত্ব, একজনের ওপর দশজনের বসে খাওয়ার মানসিকতা (সৈয়দ মুজতবা আলীর *পণ্ডিতমশাই* গল্পটা মনে আছে না?), মানুষের মেধা-যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগানোর মতো নেতৃত্বের অভাব, প্রদর্শনেচ্ছা এবং অহংবোধকে লালন করতে গিয়ে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাব, দারিদ্র্যের কারণে মানুষের মাঝে সৃষ্ট কার্পণ্য, নানান কারণেই আমাদের জনগোষ্ঠী অনাদিকাল থেকে বহির্মুখী হতে বাধ্য হয়েছে। এর ভালো দিক আছে, খারাপ দিকও আছে।

আল্লাহ বারবার তাঁর দুনিয়া ঘুরে দেখতে বলেছেন,

> ‘বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম’ (সুরা আনকাবুত: ২০)।

ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিস্তৃত হয়, নিজের অসহায়ত্বের অনুভূতি এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে; বিশ্বাসে অবিচলতা আসে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে মানুষের মানসিকতার

পরিধি বিস্তৃত হয়, এবং মানুষ জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্রতা থেকে উত্তরণ করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হয়। কারণ, আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে:

> 'মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না, এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে, তারাই জালেম। মুমিনগণ, তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত, তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' (সুরা হুজুরাত: ১১-১২)।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিজরত করা ফরজ করা হয়েছে:

> 'যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে—তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে—এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে—আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম, এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান'(সুরা নিসা: ৯৭)।

যেখানে সৎ উপার্জনের সংস্থান সম্ভব না হয়, পরিবারকে সৎ পথে পরিচালনা করা সম্ভব না হয়, নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব না হয়, অথবা অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়, সেখানে প্রয়োজন হলে দেশ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কারণ, 'সবাই ঘুস খেত বলে আমিও খেতাম; সংসার চালাতে পারতাম না বলে ঘুস খেতাম; পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে ঘুস খেতাম'—এমন বাহানাগুলো আল্লাহর সামনে গ্রহণযোগ্য হবে না।

অসহায়ত্বের শিকার হয়েই হোক, বা শিক্ষাগ্রহণের মানসেই হোক, দেশত্যাগী এই মানুষগুলো দেশকে বড়ই ভালোবাসে। বিদেশের মাটিতে থেকেও দেশের খবর জানার জন্য, দেশের খাবারের জন্য, দেশে কিছু করার জন্য উতলা হয়ে দিন কাটে তাদের। রেমিট্যান্সের টাকায় দেশে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বাড়ি-গাড়ি হয়, হয় বাবা-মায়ের চিকিৎসা; বোনদের বিয়ে হয়, বেকার ভাইগুলো মটরসাইকেল হাঁকায়;

প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। এবার তো তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। সব দিয়ে দিলে আমি চলব কী করে?'

তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তারা তাকে মেরে ফেলার জন্য তাড়া করল। তিনি কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে এক বোনের বাসায় পৌঁছুলেন। সে গোপনে ব্যবস্থা করে ভাইকে আবার বিদেশ পাঠিয়ে দিলো। তার সন্তানরা আর দেশে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেনি। এমন নানা অপ্রত্যাশিত আচরণে অনেক সময় প্রবাসী মানুষগুলোর শেকড় কেটে যায়; দেশে ফেরার বা দেশের মানুষগুলোর জন্য করার স্পৃহা হারিয়ে যায়।

এমনই সব সুখ-দুঃখের কাহিনি নিয়ে আমার এবারের উপস্থাপনা। এখানে আছে দেশে-বিদেশে দেখা চমকপ্রদ কিছু জিনিসের বর্ণনা, কিছু জায়গার কথা, কিছু ঘটনার বর্ণনা, সর্বোপরি মানুষে মানুষে সম্পর্কের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা। আমার আগ্রহের পরিধি অনেকের চেয়ে ভিন্ন। অনেক কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে, যা হয়তো অন্যদের ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আবার অনেক কিছুর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই, যা হয়তো কেউ এই ভ্রমণকাহিনিগুলোতে আশা করতে পারেন। অনেক জায়গায় গিয়েছি, যেগুলো লেখা হয়ে ওঠেনি। আবার অনেক গল্প এখানে স্থান পেয়েছে, যেগুলো প্রবাস জীবনের অংশ, কিন্তু বেড়ানোর গল্প নয়। পাঠকদের কিছু জিনিস হয়তো ভালো লাগবে, কিছু জিনিস খারাপ, কিছু জিনিস হয়তো চিন্তার দিগন্তকে পরিবর্ধিত করবে, কিছু জিনিস হয়তো ভাবাবে। ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত করাই আমার মূল লক্ষ্য। আপনাদের ভালো লাগাই আমার শ্রমের সার্থকতা নির্দেশ করবে।

বইটি আপনাদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সিয়ান পাবলিকেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

রেহনুমা বিনত আনিস

২০২৩

মটরসাইকেলে চট্টগ্রাম-বরিশাল ভ্রমণ

পারিবারিক দায়িত্ব, পেশাগত ব্যস্ততা, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার বিশাল খরচ, শ্বশুর-শাশুড়ির সাথেই থাকাতে তাগিদের অভাব—সব মিলিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বুঝিয়ে বলি, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি চট্টগ্রাম থাকেন বহু বছর ধরে। তাদের ছেলেমেয়েদের এখানেই জন্ম, এখানেই বেড়ে ওঠা; তাদের বিয়ে দিয়ে এখানেই থেকে যাওয়া। কিন্তু উভয়ের আদি বাড়ি বরিশাল অঞ্চলে। আম্মার প্রায় সব আত্মীয়স্বজন ঢাকাবাসী হলেও আব্বার আত্মীয়স্বজন থাকেন বরিশালে। অর্থাৎ আমরা বরিশাল না যাওয়ার ফলে কেবল যে তাদের আদি বাড়ি দেখা হয়নি, তা-ই নয়; তাদের আত্মীয়স্বজনদের সাথেও সেভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। এবার সংকল্প করলাম যাবই। এই সংকল্প আর কিছুতেই অবদমিত হওয়ার নয়।

আমি চট্টগ্রামের মেয়ে। বড় হয়েছি আবুধাবির মরু অঞ্চলে। সাগর পাড়ে থেকেছি সারাজীবন, কিন্তু পানিতে নামা হয়নি। জলপথে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না। তাই ঠিক হলো বরিশাল যাওয়া হবে সড়কপথে। বাহন আমাদের বিশ্বস্ত ভেসপা মটরসাইকেল। প্রস্তুতিস্বরূপ প্রথমেই আমাদের ভেসপার সিট দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে চওড়া করা হলো। স্টিলের ওপর আরামদায়ক ফোম আর চামড়ার গদি দিয়ে ব্যাকরেস্ট উঁচু করা হলো ১৮ ইঞ্চি। পেছনে একটা স্ট্যান্ড লাগানো হলো, যার ওপর স্যুটকেস দাঁড় করিয়ে নেওয়া যাবে। সামনে লাগানো হলো স্টিলের ঝুড়ি, যেন খাবারদাবার-সহ বাচ্চার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাতের নাগালে রাখা যায়। আমাদের কাপড়চোপড় নেওয়া হলো জনপ্রতি মাত্র তিনটি করে, যেন লাগেজ

এতটা ভারী না হয় যে, মটরসাইকেল ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। শুধু আমার দুই বছর বয়সী কন্যা রাদিয়ার জন্য বাড়তি কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেওয়া হলো।

২০০২ সালের মার্চ মাসের এক সকালে আমরা ফজর নামাজ পড়ে বরিশালের পথে রওয়ানা দিলাম। আত্মীয়-বন্ধু সবাই ভাবল—আমরা পাগলামি করছি; কিন্তু আব্বা এই উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন, 'ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে থেকে যথাসম্ভব দ্রুত অন্য রাস্তায় চলে যাবে। ধীরে সুস্থে চালাবে। ক্লান্ত লাগলে থামিয়ে বিশ্রাম নেবে। কাউকে ওভারটেক করার চেষ্টা করবে না। আমরা দুআ করতে থাকব। আর পথে সুযোগ পেলেই ফোন করে জানাবে—কী খবর, বা কতটুকু গেলে।'

হাফিজ সাহেব বাইক চালান ১৮ বছর বয়স থেকে। জোরে চালানোর শখের বয়স শেষ। চারপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে সকাল আটটায় আমরা এসে পৌঁছুই মুহুরী প্রজেক্টে। জলাশয়ে কতক বিদেশি পাখি খেলাধুলা করছে, কিন্তু শীতের সকালে সব পাখি তখনো নীড়ের ওম ছেড়ে বেরিয়ে আসার সাহস করে উঠতে পারেনি। চারদিক জনমানবশূন্য। বাঁধের ওপর বসে মটরসাইকেলের সামনে স্টিলের ঝুড়ি থেকে বিস্কিটের টিন আর পানি নিয়ে প্রাতরাশ সারলাম তিনজনে। আধঘণ্টার মতো বিশ্রাম নিয়ে আবার পথে নামলাম। এতক্ষণ কন্যা আমার কোলে ঘুমোচ্ছিল। এবার ফ্রেশ হয়ে বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রমণ করতে চাইল।

আমরা একটা শর্টকাট রাস্তা দিয়ে ফেনী ঢুকে গেলাম। তখন হাজারীর অত্যাচারের যুগ মাত্র সমাপ্ত হয়েছে। চারদিকে দেখে পরিত্যক্ত শহর মনে হলো, বিদেশে যাকে 'গোস্ট টাউন' বলে। প্রত্যেকটি ভবন জরাজীর্ণ, কোনো কোনো ভবনের দেওয়াল বেয়ে বেড়ে উঠছে বটগাছ, রাস্তাঘাটের ভগ্নদশা, অথচ এরই মাঝে বসবাস করছে এতগুলো মানুষ! ফেনীর ম্যাজিস্ট্রেট তখন আমাদের এক বড় ভাই। তাকে তার অফিসে গিয়ে সারপ্রাইজ দিলাম। তিনি জোর-জবরদস্তি করে আমাদের আবার পরটা, ডাল, ডিমভাজি দিয়ে নাশতা খাওয়ালেন। ফেনী ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথে তার বাসায় গিয়ে ভাবীর সাথে সালাম বিনিময় করে নোয়াখালীর পথ ধরলাম।

আমাদের মূলত পরিকল্পনা ছিল সেদিন নোয়াখালী পর্যন্ত যাওয়া। কিন্তু তখন বাজে মাত্র সকাল দশটা। তাই নোয়াখালী না গিয়ে আমরা এবার লক্ষ্মীপুরের দিকে রওয়ানা দিলাম। গ্রামের ভেতর দিয়ে এত সুন্দর পিচঢালা পথ, বাড়িতে বাড়িতে টেলিভিশনের আওয়াজ, মানুষজনের পোশাক-আশাক দেখে বুঝলাম—আগের সেই গ্রাম আর নেই, যে গ্রামের কথা কবি-সাহিত্যিকরা লিখেছেন—পাখির কলকাকলিঘেরা গ্রাম, যেখানে ভোরবেলা কৃষক ছেঁড়া লুঙ্গিখানা গায়ে জড়িয়ে

প্রবালদ্বীপে

ঈদের আগে থেকেই প্ল্যান করছিলাম টেকনাফ যাব। একবার গিয়ে এত ভালো লেগেছিল যে, আবারও যেতে ইচ্ছে হতো। গতবার প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সেন্টমার্টিন যাওয়া সম্ভব হয়নি। এবার সম্ভব হলে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

কার্যত দেখা গেল—ঈদের দিন আমার পাঁচ ননদই কক্সবাজার চলে গেল; অথচ আমি পরের দিন বসে ছাগল রান্না করছি। এক জরুরি শিপমেন্টের কাজ করতে গিয়ে হাফিজ সাহেবের ঈদের ছুটি পর্যন্ত নেওয়া হলো না। দুপুর বারোটায় উনি ফোন করে বললেন, 'মনে হয় বিকেল নাগাদ কাজ হয়ে যাবে, তুমি ব্যাগ গুছাও। আমি আম্মাকে জানাচ্ছি।'

ঈদের পরদিন, বাস-ট্রাক কিছুই চলছে না। বুঝে নিলাম—ভেসপায় যাওয়া হবে, যেমন গিয়েছিলাম বরিশাল-কুয়াকাটা ২০০২ সালে। বাক্সে যথাসম্ভব অল্প জিনিস নিলাম যেন বাক্স ভারী না হয়।

দুপুর দুটায় আমরা রওয়ানা দিলাম। আমাদের ভেসপাটা বরিশাল যাওয়া উপলক্ষ্যে মডিফাই করা হয়েছিল। যেহেতু রাদিয়া অধিকাংশ সময় আমার কোলে বসবে বা আমাদের দুজনের মাঝখানে, ভেসপার সিট বর্ধিত করা হয়েছিল প্রায় আট ইঞ্চি এবং সিটের পেছনে প্রায় আঠারো ইঞ্চি উঁচু ব্যাকরেস্ট দিয়ে বসাটা আরামদায়ক করা হয়েছিল। ভেসপার পেছনে একটা স্ট্যান্ডের মতো লাগানো হয়েছিল, যার ওপর স্যুটকেস দাঁড় করিয়ে নেওয়া যায়, এবং সামনে একটা স্টিলের ঝুড়ি লাগানো হয়েছিল, যেটাতে টুকটাক জিনিসপত্র, খাবারদাবার রাখা যায়। সব মিলিয়ে বলা

চলে—গরিবের গাড়ি। আমার ছাত্রীরা বলত—হেলিকপটার।

হাফিজ সাহেব কাজপাগল মানুষ। বাসা থেকে রওয়ানা দিয়ে প্রথমে গেলেন শিপমেন্ট ঠিকভাবে সম্পন্ন হলো কিনা—আরেকবার নিশ্চিত করতে। যখন রাদিয়া আর আমি ভাবছি—আজ আদৌ কোথাও যাওয়া হবে কিনা; এমন সময় এসে বললেন, 'কাজ হয়ে গিয়েছে'। তখন বাজে চারটা। বিসমিল্লাহ বলে রওয়ানা দিয়ে একে একে কর্ণফুলী ব্রিজ, আমাদের আদি বাড়ি পটিয়া, আমার খালার বাড়ি চন্দনাইশ—ওখানে আসরের নামাজ পড়ে আবার নানার বাড়ি সাতকানিয়া পেরিয়ে কক্সবাজারের কাছাকাছি উনার এক বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি দাঁড়ালেন মাগরিবের নামাজের জন্য। তারপর একটানে সোজা কক্সবাজার। পথে যেতে যেতে চিন্তা করলাম—বড় আপার (হাফিজ সাহেবের বড় বোন) শ্বশুরবাড়ি ছাড়া আর কোথাও থাকলে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে; অথচ ওই বাসায় অলরেডি বড় আপা ছাড়াও আমার চার ননদ তাদের স্বামী-সন্তানসহ অবস্থান করছে। এ-সময় ওদের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করা কি ঠিক হবে? যা থাকে কপালে বলে আমরা গিয়ে উঠলাম হাফিজ সাহেবের এক বন্ধুর হোটেলে। দুলাভাই খবর পেয়ে প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠলেন—রাতেই এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। ওনাদের বাসায় যে হুলস্থুল আতিথেয়তা করা হয়, তাতে একবার গেলে আর তিন দিনেও বের হওয়া যাবে না। তাই রাদিয়া ঘুমিয়ে গিয়েছে, কাল সকালে না হয় যাওয়া যাবে ইত্যাদি বলে ওনাকে ঠেকানো গেল।

ফজরের নামাজ পড়ামাত্রই হাফিজ সাহেব বললেন, 'শোনো, দুলাভাই ফোন করার আগেই আমাদের কেটে পড়তে হবে, নইলে এবারে আর টেকনাফের চেহারা দেখতে হবে না!' যেমন কথা তেমন কাজ। ছয়টা বাজতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম টেকনাফের উদ্দেশে। রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল, সকালেও কখনো কখনো টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা রেগুলার বৃষ্টিতে ভিজে কাজে আসা-যাওয়া করতাম, প্রচণ্ড বৃষ্টি ছাড়া রেইনকোট ব্যবহার করা হতো না, তাই অসুবিধা হচ্ছিল না। বৃষ্টি বেশি বেড়ে গেলে এক জায়গায় দশ মিনিট দাঁড়ালাম। আমার ননদ আইরিনের সেন্টমার্টিন যাওয়ার কথা ছিল, ওকে ফোন করলাম। জানা গেল—বড় আপার শ্বশরবাড়িতে এমনভাবে আটকিয়েছে যে, এবার আর যেতে পারার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শোকর করলাম যে, আমরা দুলাভাইয়ের কথায় যাইনি। তার পাঁচ মিনিট পর দুলাভাইয়ের ফোন, 'তোমরা কোথায়? তোমাদের রুমে তো তালা মারা!' আমরা কোথায় শুনে তো বেচারা থ!

আমরা যখন রিসোর্টে পৌঁছুই—যেখান থেকে সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে ইয়ট ছাড়ে—দেখি, ইয়টে উঠতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। এত দূর এসে এত

সহজে হাল ছেড়ে দিতে মন চাইল না। টান দিয়ে চলে গেলাম ফিশিংঘাটে। ওখান থেকেও সব নৌকা ততক্ষণে বের হয়ে গিয়েছে। ওখানের একজন পরামর্শ দিলেন—যেখান থেকে স্থানীয় লোকজনের যাতায়াতের জন্য যাত্রীবাহী ট্রলার ছাড়ে, সেখানে চলে যেতে। দ্রুত ওখানে পৌঁছে দেখি—একটা ট্রলার তখনই ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাফিজ সাহেব টিকেট নিয়ে বাক্স আর রাদিয়াকে তুলে দিলেন ট্রলারে, এখন তো আর আমাদের না নিয়ে ট্রলার ছাড়তে পারবে না; কিন্তু মটরসাইকেল রাখা হবে কোথায়? ঘাটের লোকজন বলল—এখানে এক হাজি সাহেব আছেন, সবাই ওনাকে খুব বিশ্বাস করে, ওনার বাসায় রাখা যায়; বাসা ঘাটের পাশেই। তখন বাইক রেখে আসার সময় নেই। কী করা যায়? আল্লাহর কি রহমত! হাজি সাহেব তখন ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সব শুনে বললেন—উনি লোকমারফত বাইক বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। হাফিজ সাহেব হাজি সাহেবের হাতে বাইকের চাবি দিয়ে ট্রলারে চড়ে বসলেন।

ট্রলার চলছিল খুব দ্রুত গতিতে, আর ট্রলারঘাট ছিল ইয়টের ঘাটের অনেক পরে; নাফ নদীর মোহনার কাছাকাছি। কিছু দূর যাওয়ার পর পেছনে ইয়ট দেখতে পেলাম। তখন মনে হলো—ইয়ট না পেয়ে ভালোই হলো। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল—ওখানে গাদাগাদি অবস্থা, বেচারার যেন চলতেই কষ্ট হচ্ছে। এমন সময় শুনি ইয়টের থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে, 'হাআআআফিজ ভাআআআই...!' আমরা তো অবাক! দেখি তিনজন মানুষ হুলস্থুল বেগে হাত নাড়ছে, আর চিৎকার করছে। আরে, এ যে দেখি রুবেল, ইসমাইল আর আহসান ভাই! 'সেন্টমার্টিনে নেমে দেখা হবে' বলতে বলতে আমাদের ট্রলার এগিয়ে গেল।

ততক্ষণে আমরা নদী এবং সাগরের মিলনস্থল পেরোচ্ছি। অদ্ভুত ব্যাপার! নদীর পানি এবং সাগরের পানি—দুটোই পানি হওয়া সত্ত্বেও একটি অপরটির সাথে মিশছে না; দুটোর রঙ স্পষ্টভাবে আলাদা দেখা যাচ্ছে। যেন এই আয়াতদ্বয়ের চাক্ষুস ব্যাখ্যা—

> 'তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না' (সুরা রহমান: ১৯-২০)।

বিজ্ঞানের আগ্রহী ছাত্রী আমি। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নদী গিয়ে সাগরে পড়ে ঠিকই, কিন্তু মিলিত হয় না; বরং সাগরের তলদেশে আলাদা স্রোত হিসেবে প্রবাহিত হতে থাকে। সাগরের পানি এবং সাগরের তলদেশে বহমান এই নদীর পানির উপাদান আলাদা, রঙ আলাদা, স্বাদ আলাদা, তাপমাত্রা আলাদা, এতে বসবাসকারী

আবারও ডাইনোসর মিউজিয়ামে

বহুদিন পর আবার ড্রামহেলারের পথে রওয়ানা হলাম, রয়াল টিরেল মিউজিয়ামে (Royal Tyrell Museum), ডাইনোসরদের দেখতে। গতবার সাথে ক্যামেরা ছিল না। এমন জায়গায় কেউ ক্যামেরা ছাড়া যায়? এবার তাই সাবধান ছিলাম, যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। হাফিজ সাহেব, রাদিয়া আর আমি মিলে শ তিনেক ছবি তো তুলেছিই। তন্মধ্যে মাত্র ক'খানা ছবির মাধ্যমে অভিজ্ঞতাটার যতটুকু আমার ভাষা এবং স্মৃতিশক্তিতে কুলোয়, তা আমাদের মতো ডাইনোসরপ্রেমীদের জন্য শেয়ার করলাম।

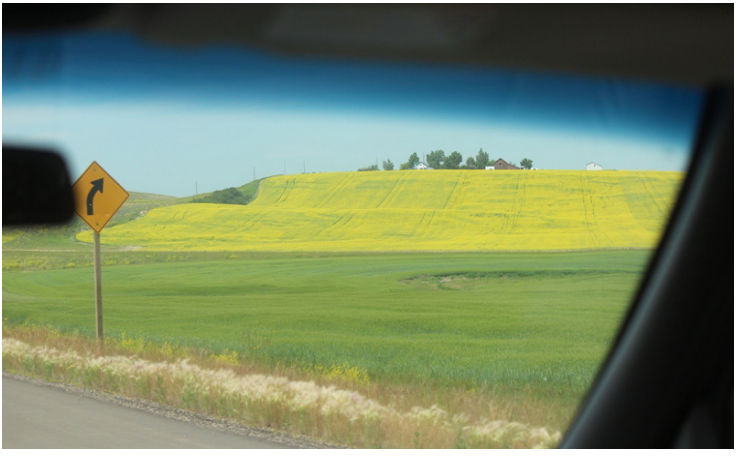

এই গেটটি দেখলে টাইম মেশিনের কথা মনে হয়। আদিযুগের পর্যায়গুলো এমনভাবে সাজানো, যেন পছন্দমতো সুইচ টিপে চলে যাওয়া যাবে ওই যুগে, দেখে আসা যাবে তখনকার বাসিন্দাদের।

এরাই সেই বিজ্ঞানী, যাদের বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে আমরা আজ ডাইনোসরদের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি, বা অন্তত এ-সম্পর্কে কিছুটা

যুগে) এবং বিদায় নিয়েছে বেশ তাড়াতাড়ি। দেখতে হাতির মতো হলেও তারা বৈজ্ঞানিকভাবে হাতির আত্মীয়স্বজনের মধ্যে পড়ে না।

ইনি গন্ডারের পুর্বপুরুষ, তখনো বেচারার চামড়া বেশ মোটাই ছিল!

এটা এতদঞ্চলে প্রাপ্ত সেবরটুথ বাঘের কঙ্কাল। বাইরের দাঁতগুলো দেখতে ভয়ানক হলেও ওর মুখের ভেতরের দাঁতগুলো ছিল আরও ভয়াবহ, জাঁতার মতো পিষে ফেলার যন্ত্রসদৃশ। একে আইস এজ কার্টুনে ভিলেন হিসেবে দেখা যায়, যে পরে ভালো হয়ে যায়। আমরাও যদি এভাবে নিজেকে বদলে ফেলার, ভালো হয়ে

যাওয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে বেশ হতো।

প্রচণ্ড গরমের মাঝেও এই গাছগুলোর মতো ছায়াঘন স্নিগ্ধ আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আমার প্রভুর সৃষ্টি যতই দেখি, ততই মুগ্ধ হই, ততই কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হই। যিনি এই বিশালকায় ডাইনোসদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই ক্ষুদ্রকায় আমাকে। এরা একসময় জলে, স্থলে, আকাশে দাপটের সাথে বিচরণ করত, কিন্তু তাদের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য একটি উল্কাপিণ্ডই যথেষ্ট ছিল। এই বিপজ্জনক পৃথিবীতে যিনি আমার মতো তুচ্ছ একটি জীবকে কিছুদিনের জন্য বসবাস করার, পরবর্তী জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার সুযোগ দিচ্ছেন, তাঁর কাছে কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা সম্ভব?

ড্রামহেলার, ২০১৪